এএলআরডি আয়োজিত (১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮; ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত) "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন -এর জরুরি গুরুত্ব ও খাদ্য যোগানের নিশ্চয়তা" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ (এএলআরডি টিম কর্তৃক প্রণীত):

ভূমিকা: কৃষিজমি রক্ষা, ভূমি সংরক্ষণ, পরিবেশ বান্ধব ভূমি ব্যবহার ও ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ২০০১ সালে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করে। বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সেটি ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কিন্তু তার যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এটি এখন একটি কাগুজে নীতি হয়েই রয়েছে। ক্ষমতায় আসার আগে ২০০৮ সালে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'দারিদ্র্য ঘোচাও, বৈষম্য রুখো' শিরোনামের ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হবে কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা। হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা হবে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে ৪.৫ কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প 'একটি বাড়ি একটি খামার', আশ্রয়ন, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম, ঘরে ফেরা, বাস্তবায়ন করা হবে।" ইশতেহারে 'কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন' শিরোনামের ৭ নং দফায় ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি কৃষিজমি সুরক্ষায় সরকারের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই। ফলে দেশের কৃষিজমি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অপরিহার্য ভূমি ও কৃষি সংস্কারমুখী কোন দৃশ্যমান উদ্যোগ বা কর্মসূচিও সরকারের নেই। তাই কেবল বসতবাড়ির জন্যই কৃষিজমির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার হচ্ছে না, সড়ক ও রেলপথসহ নানা ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আবাসন প্রকল্প, শিল্প ও বাণিজ্যিক স্থাপনার জন্য ফসলি জমিতে হাত পড়ছে। বিদ্যমান বাস্তবতায় শিল্প ও বাণিজ্যের গুরুত্ব অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। কিন্তু স্বল্প আয়তন ও ঘনবসতির বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার দিকটিকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় রাখা জরুরি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান ও প্রথম উৎস হচ্ছে কৃষি, আর কৃষির মূলভিত্তি হলো জমি। এই কৃষিজমি দিন দিন যে হারে হারিয়ে যাচ্ছে তা যদি রোধ করা না যায় এক সময় খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হতে বাধ্য। কৃষিজমি রক্ষার জন্য ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করা জরুরি। কিন্তু স্বাধীনতা ৪৬ বছর পর হলেও আমাদের দেশে কৃষিজমি সুরক্ষা এবং ভূমি ব্যবহারের জন্য কোনো আইন প্রণীত হয়নি। ভূমি ও কৃষি জমি রক্ষায় রাষ্ট্রের সমন্বিত কোনো পরিকল্পনাও নেই। ফলে অপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক হারে কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। যেখানে সেখানে গড়ে উঠছে বাড়ি। নির্মাণ করা হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাস্তা, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার দোকানসহ বিভিন্ন রকমের স্থাপনা। হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প, বাণিজ্যিক ব্যবহার, প্রভাবশালী ও ভূমিদস্যুদের দখলে চলে যাচ্ছে সাধারণ কৃষকের জমি। কৃষি জমি দ্রুত অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশের মোট ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮৪১ দশমিক ৯৩ হেক্টর ভূমির মধ্যে আবাদযোগ্য জমি ৮৫ লাখ ৫ হাজার ২৭৮ দশমিক ১৪ হেক্টর। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট ভূমির ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ জুড়ে বনভূমি, ২০ দশমিক ১ শতাংশে স্থায়ী জলাধার, ঘরবাড়ি, শিল্প-কারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি, অবশিষ্ট ৬৬ দশমিক ৬ শতাংশ জমি কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৩টি। তাদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক। সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের কৃষিজমি বিলুপ্তির প্রবণতা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০০ থেকে ২০১১ এই ১২ বছরে দেশে প্রতিবছর ৬৮ হাজার ৭৬০ হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে গেছে। ঐ গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গত এক দশকে (২০০১-২০১২) গড়ে প্রতি বছর ফসলি জমির পরিমাণ ৬৮ হাজার ৭ শত হেক্টর করে কমেছ, যা মোট ফসলি জমির শূন্য দশমিক ৭৩৮ শতাংশ। অথচ পূর্বের তিন দশকে প্রতি বছর ফসলি জমি কমেছে গড়ে ১৩ হাজার ৪১২ হেক্টর। একই সাথে প্রতি বছর আবাসন খাতে ৩০ হাজার ৮০৯ হেক্টর, নগর ও শিল্পাঞ্চলে চার হাজার ১২ হেক্টর এবং মাছ চাষে তিন

হাজার ২১৬ হেক্টর জমি যুক্ত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৯৭৬ হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত শূন্য দশমিক ১৩৭ শতাংশ হারে কমলেও, ২০০০ হইতে ২০১০ সাল মেয়াদে ওই হারের পাঁচ গুণেরও বেশি শূন্য দশমিক ৭২৮ শতাংশ হারে কৃষিজমি কমেছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন ২০০৩ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ২৬,৫৫,৭৩১ একর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে গেছে। গড়ে প্রতি বছরে ২,৪১,৪৩০ একর অর্থ্যাৎ গড়ে প্রতিদিন ৬৬১.৪৫ একর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। অকৃষি খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে- বসতবাড়ী তৈরী, কন্ট্রাক ফার্মিং, চিংড়ি চাষ, তামাক চাষ, দোকানপাট নির্মান, হাউজিং সোসাইটি নির্মান প্রভৃতি। আশঙ্কার বিষয় হলো, প্রতিবছর প্রায় ১ শতাংশ হারে কৃষিজমি কমছে। অস্বাভাবিক কৃষি জমি হ্রাসের এই প্রবণতা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-র অকার্যকারিতা ও কৃষিজমি সুরক্ষায় আইনের প্রয়োজনীয়তা: উপরোক্ত গবেষণাগুলোর ফলাফল এটিই প্রমাণ করে যে 'কৃষিজমি যথাসম্ভব কৃষিকাজে ব্যবহার' নিশ্চিত করা ভূমি ব্যবহার নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলেও বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত। যে সকল উদ্দেশ্যে এ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে তার কোনোটিই গত দেড় দশকে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়নি। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১-এ বলা আছে, কৃষিজমি কৃষিকাজ ব্যতিরেকে অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কৃষিজমি ভরাট করে বাড়িঘর, শিল্পকারখানা, ইট-ভাটা বা অন্য অকৃষি স্থাপনা কোনোভাবেই নির্মাণ করা যাবে না। কিন্তু এ নীতির বাস্তবায়নে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই, নীতি-র তোয়াক্কাও করছে না কেউ। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দাপট অনেকটা কমেছে বটে। শিল্প ও সেবাখাতে আমাদের অর্থনীতি নতুন ঠিকানা খুঁজছে। কিন্তু জনবহুল এ দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজমির ব্যবস্থা না করে শিল্প ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতি টেকসই হতে পারে না।

কৃষিজমি সুরক্ষায় নীতি থাকলেও তার বাধ্যকরি শক্তি নেই, এর জন্য শক্ত আইন প্রয়োজন। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি জমি সুরক্ষার কোন আইন নেই- এটি অত্যন্ত হতাশার। যে যার মতো করে কৃষি জমিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। জমির জোনিং না থাকায় চিহ্নিত করা যাচ্ছে না কৃষি ও শিল্পের জমি। জমির সর্বশেষ যে জরিপটি বাংলাদেশ সরকার সম্পন্ন করেছে যেটি বি আর এস বা বি এস রেকর্ড নামে পরিচিত সেখানেও জমিকে ভূমির বন্ধুরতা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করা হয়েছে, জমির উপযোগিতা বিবেচনা করে নয়। এতে একজন কোম্পানির মালিককে কৃষি জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। এসব কোম্পানি কৃষি জমিতে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে বিশাল অঞ্চল জুড়ে কৃষি পরিবেশ নষ্ট করছে। রাসায়নিক দূষণের ফলে শিল্প-কারখানার আশেপাশের কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা স্থায়ীভাবে হ্রাস পাচ্ছে। রাতারাতি নদী-নালা, খাল-বিল, ডোবা ভরাট করে কৃষি জমির স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে।

সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানের অভিজ্ঞতা: দেশের জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত ৮ টি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা- আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি, এএলআরডি, টিআইবি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ব্লাস্ট, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কর্তৃক গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের শৈলাট গ্রাম, কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়ন, বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলা, পাবনার চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা, নিমাইচড়া ও হান্ডিয়াল ইউনিয়ন ও নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় যৌথভাবে সরেজমিন তথ্যানুসন্ধান মিশন পরিচালনা করে ২০১৪ সালে। এই তথ্যানুসন্ধানে উঠে এসেছে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার শৈলাট এলাকার নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রায় ৮'শ বিঘা জমি এবং ক্যামব্রিজ মেরিটাইম কলেজের নিজস্ব ক্যাম্পাসের জমি ও পুকুর ভরাট করে নিচ্ছে গ্রীন কেয়ার রিসোর্স লিমিটেড, টোটাল কেয়ার প্লাটিনাম লিমিটেডসহ চারটি কোম্পানী। অভিযোগ আছে, স্থানীয় কতিপয় দালাল চক্রের সহযোগিতায় প্রভাবশালী ভূমিদস্যু চক্রটি ওই এলাকার নিরীহ গ্রামবাসীর কৃষিজমি জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে দখল করে নিচ্ছে। এলাকাবাসী অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুললে চক্রটি বিভিন্ন মামলা দিয়ে লোকজনকে হয়রানি করে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কক্সবাজারের রামুতে নতুন সেনানিবাস নির্মাণের জন্য বনবিভাগের প্রায় ১৮০০ একর জমি সেনাবাহিনীকে বরাদ্দ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার লঙ্ঘন করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত না নিয়ে বান্দরবানের রুমায় নতুন একটি সেনানিবাসের জন্য

৯৯৭ একর জমি সেনাবাহিনীকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৩৬ টি আদিবাসী পরিবার যার মধ্যে ১০ টি পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হবে। অন্যদিকে, চলনবিলের পাবনা চাটমাহর অংশের কৃষিজমিতে নতুন সেনা স্থাপনা নির্মানের জন্য ১৪০৮.০৫ একর জমি বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে সেনাবাহিনী। এ জমি বরাদ্দ দেয়া হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ২৯৪১টি পরিবার যার মধ্যে ২৪৩৯ টি কৃষিজীবী পরিবার পুরোপুরি ভূমিহীন হয়ে পড়বে। এছাড়া নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার চরাঞ্চলে প্রায় ৪৫ হাজার একর কৃষিজমি সেনাবাহিনীকে বরাদ্দ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে এর ফলে কৃষিজমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হবে কৃষিনির্ভর সাড়ে তিন হাজারের বেশি পরিবারকে।

ডিটেইল এরিয়া প্যানে (ড্যাপ) জাঙ্গারিয়া বাজারের কিছু অংশ আরবান রেসিডেন্স ও কিছু অংশ ফ্লাড ফ্লো জোন,পূবগাঁও জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন,রূপগঞ্জের কিছু অংশ আরবান রেসিডেন্স ও কিছু অংশ ফ্লাড ফ্লো জোন, বেইলারটেক আরবান রেসিডেন্স,বেরাইদ আরবান রেসিডেন্স, বড়ালু আরবান রেসিডেন্স,বরুণা আরবান রেসিডেন্স, তালাসকোট ফ্লাড ফ্লো জোন,বাসুনিয়া ফ্লাড ফ্লো জোন ও পূবগাঁও আরবান রেসিডেন্স হিসেবে দেখানো হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী খেলার মাঠ,উন্মুক্ত স্থান,উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার হিসেবে চিহ্নিত জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাবে না বা উক্তরূপ জায়গা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাবে না বা অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ভাড়া,ইজারা বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। এতদসত্বেও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই রূপগঞ্জ উপজেলার পাঁচ হাজার বিঘা জমি অধিগ্রহণ করে পূর্বাচল উপশহর বানিয়েছে। এ ছাড়া এ এলাকায় আশালয়, বসুন্ধরা, ঢাকা ভিলেজ সহ ব্যক্তিমালিকানাধীন ২০টি বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানি জমি ক্রয় করছে। রূপগঞ্জ উপজেলার রূপগঞ্জ ইউনিয়ন মোট ২০টি মৌজায় ৭১৪২.৮৪ একর জমি সেনাবাহিনীর আবাসন প্রকল্পের জন্য জোরপূর্বক অর্ধেক দামে কেনার অভিযোগও রয়েছে।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের বাজঘাট ইউনিয়নের সিটি গ্রুপের মালিকানাধীন নাহার চা বাগান এবং মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউরা উপজেলায় ঝিমাইপুঞ্জি'র চা বাগান সম্প্রসারনের নামে প্রাচীন গাছ কেটে খাসিয়াদের উচ্ছেদের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। যাতে ৬৩টি খাসিয়া পরিবারের ৫০০ খাসিয়া এবং ঝিমাই পুঞ্জির প্রায় একশত পরিবার তাদের জুমের জমি সহ বসতবাড়ী হারাবে।

জেলা বগুড়ার কাহালু ও দুপচাঁচিয়া থানার সীমান্ত ঘেঁষে ঐতিহাসিক নাগর নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীর দুই পাড়ের কৃষি জমি রক্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানি ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নদীর উভয় পার্শ্বে উঁচু বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু একটি প্রভাবশালী শ্রেনী হাঙ্গর ড্রেজার, কপিকল ইত্যাদি দ্বারা কাহালু থানার কালাই মৌজার থিয়টপাড়া, চাকলা শ্মশান ঘাট, ঘোনপাড়া, ফেলিতলা, বকুলতলা, বীরকেদার মৌজার চকবন্যা, ধাপ, মদনাই, সঞ্জয়পুর, টিটিয়া ইত্যাদি এলাকায় নাগর নদীর উভয় পাশে বেরী বাঁধসহ তার আশেপাশের ফসলী জমির মাটি ৩০ থেকে ৪০ ফুট গভীর করে কেটে ট্রাকে করে স্থানীয় এলাকায় অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ইট ভাটায় উক্ত মাটিগুলি বিক্রয় করে। এর ফলে শত শত বিঘা আবাদী জমির ধরণ পরিবর্তিত হয়ে গভীর খাদে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ব্রাহ্মণডুড়া ইউনিয়নে অবস্থিত চলমান প্রাণ-আর.এফ.এল, স্কয়ার, আর.এ.কে, বাদশাহ্ সহ শিল্প কারখানাগুলির বিষাক্ত বর্জ্যে ঐতিহাসিক খরস্রোতা সুতাং নদীর পানিকে এখন বিষাক্ত নদীতে পরিণত করেছে এবং এই তিনটি উপজেলার লক্ষাধিক একর জমির কৃষি ফসল, গরুর ঘাস এবং সকল প্রকার মাছ মরে যাচ্ছে। এছাড়াও সংলগ্ন কৃষি জমি অউর্বর হয়ে পড়ছে। যদিও প্রতিটি কারখানায় ই.টি.পি থাকার বিধান রয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাবার জন্য তবুও তার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়না।

কৃষিজমিতে ইটভাটার প্রভাব : দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের জন্য নির্মাণ কার্যক্রমে ইটের চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশেও বর্তমানে ইটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, সরকারি হিসাব অনুযায়ী ইটভাটার বর্তমান সংখ্যা ৬ হাজার ৯৩০। এগুলো বেশিরভাগ কৃষিজমির ওপর গড়ে উঠেছে। দেশে বার্ষিক উৎপাদিত ইটের পরিমাণ ১৭ দশমিক ২ বিলিয়ন। এই ইট তৈরিতে ১২৭ কোটি সিএফটি মাটির দরকার হয়। এই মাটি সংগ্রহ করা হচ্ছে কৃষিজমির সবচেয়ে উর্বর অংশ জমির উপরিভাগের মাটি বা Top soil। ফলে জমির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে এবং

উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। কৃষিজমি ও পরিবেশ সুরক্ষায় প্রচলিত ইটের বদলে সরকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হাউস বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট ইটের বিকল্প ব্লক উদ্ভাবন করেছে। এতে মাটি পোড়ানো ছাড়াই বালু, নদীর পলি ইত্যাদি বিকল্প উপকরণ ব্যবহার করে ইটের চেয়েও উপযোগী নির্মান সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব। নির্মান কাজে এই ব্লক ব্যবহারে ব্যবহারের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

কৃষিজমি সুরক্ষায় করণীয়ঃ বিশেষজ্ঞদের মতে কৃষি জমিকে সুরক্ষার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (১) কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইনটি খুব দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। (২) দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের জমিকে উপযোগিতা অনুযায়ী চিহ্নিত করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত বি আর এস এর সূত্র ধরেই খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই এটি করা সম্ভব। (৩) কৃষকই যাতে কৃষি জমি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। যেহেতু জমি রেজিস্ট্রেশনের সময় ক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয় এবং জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রত্যেক নাগরিকের পেশা উল্লেখ থাকে সেজন্য ক্রেতার পেশা কেবল কৃষি হলেই তার নামে কৃষি জমি রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করা কোনো কঠিন কাজ হবে না। এতে ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবীদের মালিকানাধীন কৃষি জমি বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষককেই বেছে নিতে হবে। ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবীদের কৃষি জমি শুধু বিক্রির অধিকার থাকায় এবং কৃষি জমি ক্রয়ের অধিকার না থাকায় একসময় দেশের সকল কৃষি জমি প্রকৃত কৃষকের হাতে চলে যাবে। (৪) ইতোমধ্যে যে সকল কৃষি জমি অ-কৃষি খাতে চলে গেছে সে জমিগুলো উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৫) কৃষির সাথে পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক থাকায় দেশের ২৫% বনভূমি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করতে হবে। উজাড়কৃত বনভূমি ও বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা ভূমিতে যাতে প্রাকৃতিকভাবেই বন গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এদেশের জাতীয় এজেন্ডায় কৃষি ও কৃষক দিন দিন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। ফলাফল- ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের সমন্বিত কোনো পরিকল্পনা নেই, রাষ্ট্র জমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে দিন দিন কৃষি জমির পরিমাণ কমছে। দেশ ধাবিত হচ্ছে চরম সঙ্কটের দিকে। ভবিষ্যতে এদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষিজমির অকৃষি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, উর্বর কৃষিজমি যাতে কোনোভাবে ফসল উৎপাদন ছাড়া অন্য কোনো ব্যবহারে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহারঃ ২০১১ সালে প্রথম কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-এর খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার, কিন্তু দীর্ঘ ৬ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আইনটির খসড়া চূড়ান্ত করতে পারে নি। আমাদের আশঙ্কা ভূমিদস্যু ও স্বার্থান্বেসী চক্রের গোষ্ঠীর স্বার্থের কারণে এই আইনের খসড়াটি কার্পেটের তলায় চলে গেছে।

বর্তমানে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি এবং আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির কারণে খাদ্য উৎপাদন আগের তুলনায় বেড়েছে। এটি সত্য যে, বর্তমানে দেশে তেমন কোনো প্রকট খাদ্য সঙ্কট নেই। তবে এই অবস্থা দীর্ঘদিন বজায় থাকবে না। ক্রমাগত কৃষিজমি ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাবে। কৃষিজমিতে কেবল খাদ্যশস্যই উৎপাদন হয় না, পাটের মত অর্থকরি ফসল, বাঁশ ও কাঠ উৎপাদনসহ গবাদি পশু, পোল্ট্রি ও মৎস্য খাদ্যের যোগানও কৃষিজমি থেকেই আসে। এর সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এই দেশে খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তার বিষয়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ২০০৭ এবং ২০১৭ সালের অভিজ্ঞতা আমাদের এটিই শিক্ষা দেয় যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কিংবা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গণমানুষের খাদ্যের যোগান কিংবা খাদ্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয় না। খাদ্যশস্যের নিজস্ব মজুদ না থাকলে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর আপদকালীন খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলা অত্যন্ত দুরুহ বিষয়। তার সাথে লবণাক্ততার প্রসারসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা ঝুঁকি তো আছেই।

১৬ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দেন যে কৃষকেরা তাদের জীবন-জীবিকা, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষিজমি রক্ষার বিষয়টি জরুরি। দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কৃষিজমি সুরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। বিষয়টি সকলকেই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং কৃষিজমি সুরক্ষায় সরকারিভাবে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকেই উদ্যোগী হতে হবে। সর্বোপরি ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশটির ভূমি ব্যবস্থাপনায় কঠোর হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের উদাসীনতা বৃহৎ জনগোষ্ঠির এই দেশটির ভবিষ্যত অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে পারে।

আমরা কখনোই উন্নয়নের বিরুদ্ধে নই। তবে সেই উন্নয়ন হতে হবে কৃষিজমিকে রক্ষা করে। আমরা প্রতিনিয়তই শুনছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা কৃষিজমি সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেবার কথা বলছেন কিন্তু ভূমিগ্রাসী এই সকল ঘটনায় সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যা আমাদের আরো ভাবিয়ে তুলছে। যেহেতু এই দেশকে, এ দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে কৃষকরা, তাই কৃষিজমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করে তা বাণিজ্যিক ও অকৃষি খাতে ব্যবহার যেকোনো মূল্যে রোধ করতে হবে। পরিশেষে আমরা জোড়ালোভাবে দাবি করছি, এই সংসদের নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেই "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন" পাশ করে তা দ্রুত কার্যকর করা হোক। যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় সত্যিই অতীব জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কৃষিজমি সুরক্ষায় নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি-

১. কৃষিজমি হ্রাস করে অকৃষি কাজে ব্যবহার বন্ধে ২০০১ সালের জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবিলম্বে প্রস্তাবিত **কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন**-এর প্রণয়ন ও কার্যকরীকরণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১-এর অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী জমির মালিকানাস্বত্ব সংক্রান্ত জটিলতা, বিরোধ, জালিয়াতি- হয়রানী ও খাসজমির বেদখল রোধে Certificate of Land Ownership (ভূমির মালিকানা সনদ) স্কীমটি দ্রুত প্রচলন করতে হবে।

৩. ভূমি ব্যবহার নীতির অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিত করা ও যথেচ্ছ ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহার্য জমির এলাকা ভিত্তিক জোন নির্ধারণের কার্যক্রমটি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। কৃষি এলাকায় সরকারী-বেসরকারিভাবে স্থাপনা তৈরিসহ সকল প্রকার অকৃষি ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। জনমানুষের স্বার্থে ভূমি মন্ত্রণালয়কে দ্রুত এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. ভূমি অধিকার সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যেই বন্দোবস্ত দেয়া সুনিশ্চিত করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কৃষি খাসজমি কোনো প্রকার অকৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না এরকম চূড়ান্ত আইনী বিধান প্রবর্তন ও কার্যকর করতে হবে। অন্যদিকে অকৃষি খাসজমিকে কেবল উন্নয়ন কাজেই বন্দোবস্ত দেয়ার বিধান করতে হবে।

৫. প্রভাবশালীরা উপকূলের বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে লোনা পানি তুলে চিংড়ি, কাঁকড়ার চাষ করছেন। এতে একদিকে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাওয়ার পাশাপাশি পাশ্ববর্তী জমির ফসল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকায় বছর বছর লোনা পানি ঢুকে পড়ার কারণে এসব এলাকার নিম্নাঞ্চলের ফসল বিবর্ণ হয়ে নষ্ট হচ্ছে, কৃষিজমি চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে আর এর ফলে পথে বসতে চলেছে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কৃষক। লবণাক্ততা রোধে এসব প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়াসহ সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।

৬. কৃষিজমি সুরক্ষার বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। ভূমিগ্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

৭. ইটভাটার গ্রাস থেকে কৃষিজমিকে বাঁচাতে হবে।

৭.১. কৃষিজমির ওপর স্থাপিত সকল ইটভাটা বন্ধ করতে হবে ।

৭.২. উৎপাদিত ইট ব্যবহারের সময়সীমা ঘোষণা করে, ইটের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে রোধ করতে হবে।

৭.৩. সরকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইটের বিকল্প ব্যবহারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারী নির্মান প্রকল্পে ব্লকের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৮. গ্রামীণ ও নগর আবাসনের ক্ষেত্রে Vertical expansion (উলম্ব বিস্তার) বা বহুতল আবাসন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে।